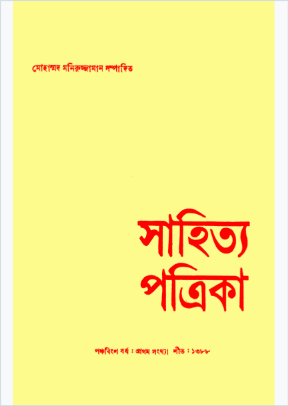

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোমোহন ঘোষ
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.15
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.15
Pages	233-240
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য

মনোমোহন ঘোষ

খুব বেশী দিন হয়নি যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের স্বষ্টি হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তেমন সুস্পষ্ট নয় এবং এ হেন অস্পষ্টতার ফলে এই সাহিত্য স্বষ্টির গৌরব আরোপিত হয়েছে একাধিক ব্যক্তির উপর। কেউ কেউ বলেন যে উইলিয়ম কেরীই এই সাহিত্যের জনক, আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের নামও কেউ কেউ এই সঙ্গে জুড়ে দেন; কেউ বা বলেন রামমোহন রায়ই এই সাহিত্যের শৈশবে পিতার কাজ করেছেন; আর অন্যদের মত হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সত্যিকারের স্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে যাঁরা টেকচাঁদ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এই সকল দাবীর প্রতি-দ্বন্দ্বিতার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিতান্ত অসহায় ভাবে আত্মগোপন ক'রে আছে। উপ-স্থিত প্রবন্ধে তাকে আবিষ্কার করার আংশিক চেষ্টা করা যাবে। বাংলা গদ্য-সাহিত্য-স্বষ্টির ব্যাপারে রামমোহন রায়ের প্রভাব কতখানি তাই হবে আমাদের আলোচ্য।

১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াবার জন্যে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ চৌদ্দখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ-সকলকে 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা' নামে উল্লেখ করা হবে। এ-দেশের আধুনিক সাহিত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে উক্ত গ্রন্থমালার প্রভাব সম্বন্ধে যে-ধারণা চলে আসছে তা সর্ব্বৈব যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না। বর্ত্তমান যুগে, এ-সকল বইতেই সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্য রচনার কাজে গদ্যের ব্যবহার হয়েছে সত্য বটে, কিন্তু এদের সম্বন্ধে এ কথাই একমাত্র কথা নয়। এই বইগুলি পাঠকসমাজে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এবং তাদের সমাদর হয়েছিল কি পরিমাণে, তা না জেনে বাংলা সাহিত্যের ওপর কেরী ও তাঁর ফোর্ট উইলিয়মী দলের প্রভাব আন্দাজ করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম হবে।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার প্রচার ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে এই পুস্তকসমূহের বিষয়বস্তুর দিকে আগে তাকাতে হবে। এদের মধ্যে পাঁচখানি সংস্কৃত ('হিতোপদেশ'[১] 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' ও 'পুরুষ পরীক্ষা'), এক খানি পারশী ('তুতি-নামা'[২]) আর একখানি ইংরেজী গল্প-গ্রন্থের ('ঈশপ্‌স ফেবলস্') অনুবাদ; অবশিষ্ট সাত-খানির মধ্যে একখানি ('ইতিহাসমালা') গল্পের সঙ্কলন, দুইখানি ('লিপিমালা' ও 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা') প্রবন্ধ-পুস্তক, একখানি ('কথোপকথন') কথাবার্ত্তার নমুনা এবং তিনখানি ('প্রতা-পাদিত্যের চরিত্র', 'রাজাবলী' ও 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র') ইতিহাসমূলক রচনা। এই শেষোক্ত সাতখানি পুস্তকের মধ্যে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় কিছু কিছু গল্প আছে, আর তিন খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থকেও গল্প-পুস্তক ব'লে গণ্য করা যায়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অধিকাংশই ছিল গল্প-পুস্তক। দেশ কাল নির্ব্বিশেষে জন-সাধারণের গল্পপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত; কাজেই মনে হ'তে পারে যে ঐ গ্রন্থমালা তখন-কার দিনে বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল এবং তার ফলে বাংলার নূতন গদ্য-সাহিত্য

ত্বরিত গতিবেগ লাভ করেছিল। কিন্তু ফলত ব্যাপারটা যে এরূপ হয়নি তা অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে ব'লে মনে হয়।

গল্প শুনতে যে লোকে আকৃষ্ট হয় তার প্রধান কারণ আখ্যানের অভিনবত্ব ও চমৎ-কারিত্ব; আর পুরানো গল্প এবং অনেক বার শোনা গল্পও যে লোকে শোনে তার কারণ অন্তর্নিহিত আদর্শের মহিমা। যেমন এ-দেশের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির গল্প; হাজার বার শুনেও সেগুলি সম্বন্ধে শ্রোতাদের আকর্ষণ শিথিল হয় না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার গল্পে এই দুইয়ের কোন গুণই বড় একটা ছিল না। সংস্কৃত গ্রন্থের আখ্যানসমূহ লোকমুখে খুবই প্রচলিত ছিল। তাই যে-ভাষায় অপরিচিত বা অল্পপরিচিত আরবী, পারশী ও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য এবং পদবিন্যাসপ্রণালী (syntax) গোলমেলে সে ভাষায় ঐ পরিচিত গল্প শুনতে লোকের তেমন আগ্রহ হয়ত দেখা যায়নি। প্রতা-পাদিত্য বা কৃষ্ণচন্দ্রাদির চরিত্র সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলতে পারা যায়।

গল্প ও গল্পমূলক পুস্তকগুলি ছেড়ে দিলে ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার যে বই বাকী থাকে তা হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'। এই বইখানিকে গ্রন্থ কারের মৌলিক রচনা ব'লে ধরা হ'লেও এর বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব খুবই অল্প। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও পুরাণাদি থেকে সঙ্কলন ক'রে এই পুস্তক তৈরী হয়েছিল। এজন্যে এখানি পাঠকদের আকৃষ্ট করবার মত বই হয়নি। রচনারীতির দিক দিয়েও এই বই বরং কিয়দংশে তাঁদের বিমুখ করবার মত। এর আরম্ভে দুর্ব্বোধ্য সমাসের বাহুল্য পাঠকবর্গের মনে রীতিমত ভয় জন্মায়। যার বিষয়বস্তু বা রচনারীতির আকর্ষণ কম, এমন বইও শুধু গদ্যের অভিনবত্বের জন্যে জনসাধারণের কৌতূহলের বস্তু হ'তে পারত কিন্তু ফোর্ট উই-লিয়ম গ্রন্থমালার দুর্মূল্যতার জন্যে তা হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ঐ পুস্তকসকলের প্রতি খণ্ডের দাম কখনও কখনও আট টাকা পর্য্যন্ত ছিল। যে-সময়ে লোকে আট-দশ টাকা মাসিক বেতনের ছোটখাট সংসার চালাত সেই সময়ের পক্ষে এই দাম সংগ্রহ করা যে কষ্টসাধ্য ছিল তা বলাই বাহুল্য।

এই সব কারণে মনে হয় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক হ'লেও উক্ত কলেজের গ্রন্থমালা তৎকালীন জনসাধারণের খুব অল্পাংশের হাতেই পৌঁছতে পেরেছিল। ঐ বইগুলি হয়ত কেবল কোম্পানীর কর্ম্মপ্রার্থী বিলাতি সাহেব ও মুষ্টিমেয় কৌতূহলী ধনী ব্যক্তিরাই ক্রয় করতে পারতেন। এরূপ স্বল্পপ্রচারিত পুস্তকের প্রভাব খুব সীমাবদ্ধ থাকবারই কথা। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে অন্যরূপ ব্যাপার ঘটেছিল তা ভাববার কোন কারণ আছে ব'লে মনে হয় না। সে যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের এই অলো-ভনীয় অবস্থা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই সাহিত্যের কৃতী প্রবর্ত্তক রামমোহন রায় যখন ১৮১৫ সালে বাংলা গদ্যে রচিত তাঁর দুখানি একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক পুস্তক ('বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার') প্রকাশ ক'রে বিনামূল্যে বিতরণ করলেন তখন থেকে বাংলা গদ্য-সাহিত্য এগিয়ে চলার মত গতিবেগ সংগ্রহ করল।

রামমোহনের পুস্তক ছিল লোকসাধারণের অনুষ্ঠিত মূর্ত্তিপূজামূলক ঈশ্বরোপাসনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনায় পূর্ণ। কাজেই এই বই প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় তুমুল আন্দোলন স্থরু হ'ল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যে অল্পসংখ্যক লোকের মনঃপূত হল তাঁরা রামমোহনের মতানুবর্ত্তী হলেন, আর যাঁরা একেশ্বরবাদ প্রচারের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবের বিভীষিকা দেখলেন তাঁরা তাঁর উপর খড়গহস্ত হ'য়ে উঠলেন। রামমোহনের বাংলা গদ্য সমসাময়িক লোকদের মধ্যে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এই ব্যাপার তার বেশ স্থস্পষ্ট সাক্ষী। এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব কেরী প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকগণের কৃতিত্বের বহু উর্দ্ধে।

রামমোহনের গদ্য-রচনার বহুল প্রচার যে কেবল ধর্ম্মবিষয়ক বাদানুবাদের আশ্রয়েই ঘটেছিল তা মনে করবার কারণ নেই। ধর্ম্মতত্ত্বের আন্দোলন তাঁর লেখা প্রচারের সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু তাঁর গদ্য-রচনার প্রাঞ্জলতাও তাঁকে এ-বিষয়ে কম সাহায্য করে নি। তাঁর প্রচারিত গ্রন্থদ্বয়ে তিনি যদি বেদান্তের মত দুরূহ বিষয়কে নিতান্ত সহজরূপে পাঠকের বোধগম্য করতে না পারতেন তবে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের তেমন বিচলিত হবার কথা ছিল না। কারণ যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিজের পুস্তক-মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি যতদিন দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ ছিল তত দিন গোঁড়া সমাজ-নায়কদের মানসিক শান্তি নষ্ট হয় নি। কিন্তু প্রাঞ্জল বাংলা গদ্যে সে-সকলের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ক'রে তিনি যখন সংখ্যাবহুল সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করলেন তখন গোঁড়ার দল বিচলিত না হয়ে থাকতে পারলেন না। একেশ্বরবাদের ব্যর্থ প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদিগণ বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করাকেও অপরাধজনক ব'লে প্রচার করলেন (গ্র. ৯-১০)।[৩] রামমোহনের বাংলা গদ্যের প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে এ হ'ল পরোক্ষ প্রমাণ। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণপ্রার্থীকে রামমোহনের রচনার সহিত ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের ও অন্যান্য সমসাময়িক লেখকের রচনার তুলনা করতে হবে। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'[৪] নামক গ্রন্থের আরম্ভে লিখছেন:—

"ব্রহ্ম সর্ব্বে বদিষ্যন্তি সমায়াতে কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ। ইত্যাদি শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত স্থলাভিষিক্ত তত্ত্বজ্ঞানিমানিরদের স্বকপোলকল্পিত স্বপ্রয়োজন সিদ্ধি তাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনার খণ্ডনার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে করিও না। যে হেতুক বিশিষ্টানুশিষ্ট শিষ্টেরদের সে কথা লক্ষ্যই নহে তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে বিশুদ্ধ মাতাপিতৃক অবিগীত শিষ্টেরদের যদ্যপি স্ব স্ব জাতি ও কুল ও আশ্রম বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণ শতেতেও অন্যথা কখন হইতে পারে না এ নিশ্চয়ই আছে তথাপি এতদ্দেশে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত জনয়তি কুমুদভ্রান্তিং ধূর্ত্তবকো হি বালমৎস্যানাং এতৎ শাস্ত্রার্থন্যায় বকধূর্ত্তেরদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রে অনাস্থা না হয় কেবল এই তাৎপর্য্যেতে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে।"

আর ১৮২৩ সালে প্রকাশিত 'পাষণ্ড পীড়ন'[৫] গ্রন্থের আরম্ভে আছে:—

"অবিরত মনস্তাপতাপিত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশেষদিগের এবং প্রতারক-প্রতারণাস্বরূপ মহাধূমান্ধকারে জন্মান্ধের ন্যায় অন্ধ তৎসংসর্গি জীববিশেষদিগের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিবসে প্রেরিত, চিরচিন্তিত, স্বকপোলকল্পিত নানা বাগাড়ম্বরিত, মন্বাদিবচনতাৎপর্য্যার্থবহিস্কৃত, স্বানুচরজীবসমাজ সন্তোষার্থ রচিত, অন্তঃসাররহিত, অল্পবুদ্ধি জনগণের আপাততঃ শ্রবণমধুর নয়নধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ, উত্তরাভাস প্রাপ্ত হইবামাত্র হৃষ্টচিত্ত কৃতকৃত্য হইলাম।"

উদ্ধৃত রচনাংশ দুটির সঙ্গে তুলনার জন্য রামমোহনের রচনা থেকেও দুটি অংশ নিচে দেওয়া যাচ্ছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র উত্তরে রামমোহন যে বই ('ভট্টাচার্যের সহিত বিচার') লিখেছিলেন তার গোড়াতে আছে:—

"ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্ত চন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্তশাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম

শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে "অশ্বচিকিৎসা" "গোপের শ্বশুরালয়ে গমন" "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" "চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং" "হাটারি বাজারি কথা নয়" "রোজা নমাজ" ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে ঐ পাঠ কর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গবিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সংক্ষেপে চন্দ্রিকা এইরূপ হয় তাহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবেক ?" (গ্র. ৬৮৫-৬৮৬)।

আর রামমোহন 'পথ্য প্রদান' নাম দিয়ে 'পাষণ্ড পীড়নে'র যে উত্তর লিখেছিলেন তার ভূমিকার আরম্ভে আছে :—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠা সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠা পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন ঐ দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কদূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন; এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদ ছলে এইরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন। অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল।"

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সমসাময়িক লেখকদের চেয়ে রাম-মোহনের রচনারীতি কত বেশী প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। কিন্তু তাঁর রচনায় এর চেয়েও সরল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন অংশ আছে। নিচে তার দুটি নমুনা উদ্ধার করা গেল।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) নামক পত্রিকায় তিনি খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের সমালোচনার উত্তরে লিখছেন :—

"বায়বেলে আদ্য তিন অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাই যে "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন" "ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন" "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে তুমি কোথায় রহিয়াছ" অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন যাহারদ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে আঘাত পড়ে। আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন এই বাক্যের দ্বারা মোসার কি তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদবিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন। আর আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ এই প্রশ্নের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন স্থানে স্থিতি ইহা জানিতেন না। যদি মোসার এই সকল তাৎপর্য্য ছিল তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎ-কার রূপে মোসা জানিয়াছিলেন এবং মোসার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থ-জ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল।" (গ্র.৪৮৮-৪৮৯)।

সংবাদ কৌমুদীতে রামমোহন চুম্বকমণি (magnet) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে আছে :—

"চুম্বকমণির কেন্দ্রাভিমুখ্যরূপ যে গুণ তাহার অন্য অন্য সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক ; যেহেতু ইহার দ্বারা নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে পথ নিশ্চয় করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে।

ইহার গুণ জানিবার পূর্ব্বে নাবিকেরদের তারা ভিন্ন কোন পথ নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না, এবং সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর যাইতে তাহারদের সাহস ছিল না। যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া ধাতু বাহির করে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও ঐ চুম্বকমণির দ্বারা তাহারদের পথ নিশ্চয় হয়, এবং চুম্বক মণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনারদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে।" (গ্র. ৮০১)।

মাঝে মাঝে দু-চারটি কথা বদল করে দিলে রামমোহনের রচনার উদ্ধৃত অংশ দুটিকে প্রায় আধুনিক বাংলা গদ্য বলে চালানো যেতে পারে। কিন্তু এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও কেউ কেউ তাঁর রচনারীতিকে তাঁর সমসাময়িক বর্গের লিপিভঙ্গীর চেয়ে নিকৃষ্ট বলতে চান। রামমোহনের সমস্ত রচনাই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা নিয়ে এবং বাদ-বিতণ্ডামূলক অতএব তাতে সাহিত্যিকগুণ থাকতে পারে না, একথা যাঁরা বলেন তাঁরাও রামমোহনের রচনা সম্বন্ধে অবিচার করেন। কারণ বাদবিতণ্ডামূলক লেখা লিখতে গিয়েও তিনি স্থানে স্থানে সাহিত্যিক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পাদরী ও শিষ্যসংবাদ' নামক বিদ্রূপাত্মক রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। খৃষ্টান মিশনারীরা হিন্দুর দার্শনিক মত নিয়ে যখন নানা কদর্থ স্থরু করেছিলেন তখন রামমোহন্ অন্যান্য লেখার সঙ্গে এটি তাঁদের উপহার দেন (অবশ্য ইংরেজী অনুবাদ সহ)। নিচে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

"পাদরি তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই ঈশ্বর এক কি অনেক ? প্রথম শিষ্য উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন। দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, ঈশ্বর দুই। তৃতীয় শিষ্য উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই।

পাদরি—হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারির ন্যায় উত্তর করিলে ?···

পাদরি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ ?

প্রথম শিষ্য—আপনি কহিয়াছিলেন যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলিগোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে আমারদিগের গণনা মতে এক, এক, এক অবশ্য তিন হয়।

* * *

পাদরী—হা এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না এবং তাঁহারদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে এমত জানিও না কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

* * *

পাদরি—এ নিগূঢ় বিষয় কিন্তু···এ গুপ্ত বিষয় কোনরূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না। (গ্র. ৪৯১-৪৯২)।

এই লেখার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ ও ত্রিত্ববাদের দ্বন্দ্ব কেমন হাস্যকরভাবে প্রকটিত হয়েছে তা যিনি এটি সম্পূর্ণ পড়েন নি তাঁকে বোঝান শক্ত হবে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রচনাটিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহনের কোন অসংযত উক্তি নেই। আর তা থাকতেও পারে না, কারণ তিনি খ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মিশনারীদের একদেশদর্শিতাই তাঁকে ঐ ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু যে কারণেই রামমোহন এই রচনা করে থাকুন তাতে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশ পেতে বাধা পায় নি। এই ক্ষুদ্র রচনা পড়ে মনে হয় তিনি যদি কেবল সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করতেন তবে হয়ত সুয়িফ্‌ট (Swift) আদির চেয়েও বড় হাস্যরসিক বলে খ্যাতি লাভ করতে পারতেন। তাঁর এই রচনাটিতে প্রচুর হাস্যরস (humour) বর্ত্তমান আছে।[৬] এ গুণ তাঁর বাদবিতণ্ডামূলক রচনায়ও যে নিতান্ত দুর্লভ তা নয়।

ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে জীবহিংসা ও মাংসভোজন গর্হিত মনে ক'রে 'চারি প্রশ্নে'র রচয়িতা আমিষাহারী রামমোহনকে যে নিন্দা করেছিলেন তার উত্তরে মাংস ভোজনের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার ক'রে তিনি 'চারি প্রশ্নের উত্তরে' লিখেছেন :—

"মৎসরতা[৭] কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। লোকে কেন খায় কেন সুখে কালযাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংসভোজন শাস্ত্রে অবিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে অন্ততঃ লোকনিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া খায় না কিম্বা আচমনে অধিক কি অল্প জল লইয়াছিল কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারব্ধনির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি।।" (গ্র. ২৩৯)।

'চারি প্রশ্নের উত্তর' পেয়ে প্রশ্নকর্ত্তা যে খুব খুশী হন নি তা বলাই বাহুল্য। অচিরাৎ তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে তার এক প্রত্যুত্তর প্রকাশ করলেন। এ বইয়ের ভাষার নমুনা আমরা দেখেছি। রামমোহন নিজের প্রতি নিন্দা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটুক্তিতে পূর্ণ এই বইয়ের উত্তরে 'পথ্য প্রদান' নামে যে বৃহৎ পুস্তক রচনা করেছিলেন তার ভূমিকায় কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, কেন যে তিনি কটুক্তির উত্তর কটুক্তি দ্বারা দেন নি। তাঁর দেওয়া একটি কারণ তাঁরই ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে।

"বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসা সময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে ঐ অবোধ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্তন না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষণার বিনিময়ে ধর্ম্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ঐ প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি।" (গ্র. ২৪৭)।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র লেখক মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাঁর গ্রন্থে রামমোহনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করছিলেন। তার উত্তরে রামমোহন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামে পুস্তক রচনা করেন। এই বইয়ের গোড়ায়ও তিনি পাল্টা দুর্ব্বাক্য ব্যবহার না করার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ—

"আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয়ক বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বদা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের

দ্বারা লোকেতে জয়ী হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।'' (গ্র. ৬৮৬)।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত তিনটি থেকে রামমোহনের যে বচনচাতুর্য্য ও সূক্ষ্ম হাস্যরস স্বষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা কেবল উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টার রচনাতেই সুলভ। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকবর্গের বা রামমোহনের সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের রচনায় এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখা দেখা যায় ব'লে মনে হয় না। আর তা হয়ত দেখাও যেতে পারে না; কারণ রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের এক বিষয়ে বিষম প্রভেদ হচ্ছে প্রেরণা সম্পর্কিত। মৃত্যুঞ্জয় বা পাষণ্ডপীড়নাদির লেখকরা লিখেছিলেন অর্থ প্রাপ্তির আশায়। তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ তাঁদের রচনায় দেখা দেয় নি; মুখ্যত সংস্কৃত, পারশী বা ইংরেজী পুস্তক বা সে সকলের বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়ে তাঁরা যে-সব রচনা করেছিলেন সেগুলো কোনও রকমে কাজ চালাবার মতো ছিল। এই তাঁদের সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা।

রামমোহন রায় যে গদ্য রচনা করেছিলেন তার পশ্চাতে ছিল মননশক্তির এবং হৃদয়-বৃত্তির সেই প্রবল প্রেরণা যার তাড়নায় মানুষ ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের ও ভবিষ্যৎ পুরুষদের মঙ্গল চিন্তা করে। এই আন্তরিক প্রেরণার ফলেই তাঁর প্রকাশভঙ্গী যথাসম্ভব সরল, সরস ও কৃত্রিমতাবর্জিত হ'তে পেরেছিল। কিন্তু উক্ত প্রেরণাই কেবল তাঁকে এ কাজে সিদ্ধি দান করে নি। রামমোহনের বহুভাষাজ্ঞান এবং ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষমতাও তাঁকে বাংলা গদ্যের কৃতী প্রবর্ত্তক করে তোলবার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর লেখা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' পড়লেই বোঝা যায় বাংলা ভাষার অনন্য সাধারণ প্রকৃতিটি কেমন ভাল রূপে তাঁর জানা ছিল। রচনাকে সুস্পষ্ট ও সুন্দর করতে হ'লে এটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর লেখার স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্যতা যে নেই তা নয়, তবে সে-সকল দুর্ব্বোধ্যতা আলোচ্য বিষয়ের দুরূহ-ত্বের জন্যে। স্থানবিশেষে তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত বাগ্‌ধারা (idiom) ব্যবহার ক'রেও রচনাকে একটু শক্ত করেছেন কিন্তু সেগুলি তাঁর জ্ঞাতসারেই ঘটেছে; এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:—

''বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে ইহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীর ভাষাতে করা যায় না।'' (গ্র. ৭)।

রামমোহনের রচনায় স্থানে স্থানে কঠিনতা থাকলেও তার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের কাজ ব্যাহত হয়নি। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের যে প্রবল আন্দোলন তিনি দেশমধ্যে স্বষ্টি করেছিলেন তার ফলে নব-প্রবর্ত্তিত গদ্যরচনা এক নূতন গতিবেগ পেয়েছিল এবং তারই ফলে ঘটল দেশীয় লোকেদের দ্বারা সংবাদপত্র প্রকাশ। এই সংবাদ-পত্রও বাংলা গদ্যকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার কম সহায্য করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের হাতে বাংলা সাহিত্যের দুর্দ্দশা ঘটেছিল যথেষ্ট। এই শোচনীয় অবস্থার হাত থেকে যিনি বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করলেন তিনি রামমোহনের পরম অনুরাগী ও শিষ্যকল্প দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ ক'রে দেবেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য সাহিত্যের বুনিয়াদ দৃঢ়তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কেবল ধর্ম্মমতাদিতে নয় রচনাপদ্ধতিতেও দেবেন্দ্রনাথের উপর রামমোহনের প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। এই দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তত্ত্ববোধিনীর প্রথম সম্পাদক (১৮৪৩-১৮৫৪) অক্ষয়কুমার দত্তের উপরে পড়েছিল আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এই প্রভাবের একান্ত

বাইরে ছিলেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সে-সকলের আলোচনা সম্ভব নয়। বারান্তরে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবে কিন্তু তার আগেই একথা বলা যেতে পারে যে, রামমোহনের প্রবর্ত্তিত গদ্যের ধারাকে আশ্রয় করেই আধুনিক বাংলার সর্ব্বজনব্যবহার্য্য গদ্য রীতি গড়ে উঠেছে। (দ্র. 'বেদান্তচন্দ্রিকা' এবং 'পাষণ্ডপীড়ন' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধারে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।)*

---

১ তিন বার তিন লেখকের দ্বারা অনুবাদিত।

২ এই গ্রন্থ সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' নামক গল্পপুস্তক থেকে সংকলিত।

৩ গ্র=রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলী, পাণিনি কার্য্যালয় (১৩১২) প্রকাশিত।

৪ এই গ্রন্থ রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থের উত্তরে লিখিত হলেও ইহাতে খাঁটি দার্শনিক আলোচনার বদলে লৌকিক তর্কযুক্তি দ্বারা একেশ্বরবাদ খণ্ডনের প্রয়াস এবং রামমোহন রায়ের প্রতি ব্যঙ্গ কটূক্তি মাত্র আছে।

৫ এই গ্রন্থও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'রই অনুরূপ উদ্দেশ্যে এবং প্রণালীতে লিখিত। ১০১-১৪।

৬ রচনাটির সম্পূর্ণ নাম হচেচ 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ। এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিন জন চীনদেশস্থ শিষ্য ইহারদের পরস্পর কথোপকথন।' স্থানাভাবে এই রচনাটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা গেল না। আর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে সমগ্র রচনার সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে তাতেও নিবৃত্ত থাকতে হ'ল।

৭ পরশ্রীকাতরতা

* [প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত।]